ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

বাংলাদেশে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি : মান ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

মল্লিক আনোয়ার হোসেন*
ডঃ আব্দুল মালেক তালুকদার**

Abstract: *Shrimp is one of the leading export items of Bangladesh. It accounts for roughly 2.5 percent of global exports and fetches a fair amount of foreign exchange. There is ample demand in the international market for shrimp and Bangladesh is blessed with an environment congenial for shrimp production. Shrimp farming is a relatively new industry in Bangladesh and is still growing and developing. However, the industry is fraught with many obstacles at present. United States and European Union are the chief importers of Bangladeshi shrimp. Shrimps exported to the U.S. and EU from any country must pass the food and safety standards set by these countries, failing which the importing countries could impose trade restrictions. Because of this, EU banned Bangladeshi shrimp several times due to presence of antibiotic residue and other health hazard materials in exported shrimp. The buyers imposed some precondition in addition with Hazard Analysis at Critical Control Point (HACCP) system for shrimp exporting country like Bangladesh. HACCP focuses on three specific hazards: micro-biological hazards, chemical hazards and physical hazards. In the shrimp industry, it is applicable at production, processing, wholesale and retail stage. The first two stages are in the exporting country, while the third stage is controlled in the importing country. In each stage of production, the HACCP system defines the critical control point and provides a set of standards to be followed. The processing plants are, at the moment, subjected to this system. The primary producers, the shrimp farmers, are yet to be subjected to this system. So, it is necessary to change the present policy and ensure strict monitoring and updating of hygienic and quality standards of exported shrimp to ensure success. At the same time the role of the fisheries department should be clearly outlined and updated to ensure that shrimp industry can operate smoothly. If all these strategies could implement properly in the shrimp industry then Bangladesh will increase its market share and ultimately become one of the leaders in the global shrimp market. The article looks into the problems regarding quality and hygienic standard of exported shrimp and suggests some innovative strategies by which Bangladesh could produce and export health friendly shrimp in the global market.*

---

* সিনিয়র সহকারী সচিব (ওএসডি), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পিএইচডি ফেলো, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী :

** উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে এবং সামুদ্রিক মুক্ত জলাশয়ে চিংড়ির উৎপাদন হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৩৭ লাখ হেক্টর এবং মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.৪৭ লাখ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৪ প্রজাতির এবং সামুদ্রিক মুক্ত জলাশয়ে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (ইসলাম, ২০০৫)। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ির উৎপাদন শুরু হয় আশির দশকের গোড়ার দিকে। তবে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানি শুরু হয় সত্তর দশকে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিশ্ব বাজারে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানি শুরু করে। ১৯৭২-৭৩ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় ৩২ লাখ ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়। মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮৪ কোটি টাকা । ২০০৩-০৪ অর্থবছরে আয় বেড়ে দাঁড়ায় ২২০০ কোটি টাকা (এম ইসলাম, ২০০৫)। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে চিংড়ি থেকে আয় হয় ৩২৮০ কোটি টাকা, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৩৬ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮১ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬)। তিন দশকের অধিক সময় পর হিমায়িত চিংড়ি থেকে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা (মোস্তফা, ২০০৫)।রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানির লক্ষমাত্রা ধার্য করেছে (*দৈনিক সমকাল*, ১৭ নভেম্বর ২০০৫)।

গত ৩২ বছরে চিংড়ি থেকে আয় বেড়েছে প্রায় ১০০ গুণ। রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদের সিংহভাগ হিমায়িত চিংড়ি। ১৯৯৫-৯৬ সালে চিংড়ির উৎপাদন ছিল ৬৮৩৪৯ মেট্রিক টন। ২০০২-০৩ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৩,৪৬১ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত চিংড়ির ৭০-৮০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়, অবশিষ্ট ২০-৩০ ভাগ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে । রপ্তানিকৃত চিংড়ির এক-তৃতীয়াংশ রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং অবশিষ্ট চিংড়ি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয় (দৈনিক ইনকিলাব ১৭ আগস্ট ২০০৫)। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পে সর্বপ্রথম বিপর্যয় নেমে আসে। কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী অল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি হওয়ার লোভে রপ্তানিকৃত চিংড়িতে সাবুদানা, বার্লি ও বিভিন্ন ক্ষতিকর তরল দ্রব্য ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করেন। আমদানিকারী দেশগুলোতে ঐসব ক্ষতিকর দ্রব্য সনাক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে ফ্রজেন ফুড এক্সপোর্টারর্স অ্যাসোসিয়েশন ও সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অবকাঠামোগত সংস্কার করে কারখানায় উন্নয়ন করা হয়। কিন্তু আমদানিকারী দেশসমূহ সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের চিংড়ির উপর আস্থা রাখতে পারেনি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি ও বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে আশঙ্কা রয়েই গেছে। তাই বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের অন্যতম এই খাতটিকে ধরে রাখতে হলে চিংড়ির উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রতিটি ধাপে চিংড়ির স্বাস্থ্য ও মান সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. খামার পর্যায়ে মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদনের অন্তরায়

বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চিংড়ির চাষ বাড়তে থাকে। চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি রেণু সংগ্রহ করা হতো। চাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে কম পরিমাণ রেণু আহরণ হওয়ায় থাইল্যান্ড থেকে রেণু আমদানি করা হয়। দেশে তখন রেণু উৎপাদনের পর্যাপ্ত হ্যাচারি গড়ে ওঠেনি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত চিংড়ি রেণু ভাইরাস আক্রান্ত থাকায় বাংলাদেশের চিংড়ি খামারসমূহ ক্রমান্বয়ে ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯৫ এর পর অধিকাংশ চিংড়ি খামার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় (বিশ্বাস, ২০০৪)। ফলে খামার পর্যায়ে মান সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদনে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। ভাইরাসে আক্রান্ত চিংড়ি দুর্বল প্রকৃতির। দেহ বর্ণ লালচে ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়, দেহের শিরোবক্ষ ও উদরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। ফলে চিংড়ির গুণগত মান নষ্ট হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য কমে যায়।

৩. খামার ব্যবস্থাপনা ও মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন

চিংড়ির মান সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে চিংড়ি চাষের শুরু থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত উন্নত গাইড লাইন অনুসরণ করা প্রয়োজন । আমাদের দেশে নিবিড়, আধানিবিড় ও সম্প্রসারিত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। চিংড়ি চাষের জমি তৈরির সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করলে খামার দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । চিংড়ির শতকরা ৭৫ ভাগ রোগ হয় প্রটোজোয়া পর্বের জীবাণু দ্বারা। বাংলাদেশের চিংড়িতে যেসব রোগ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম 'হোয়াইট স্পট' নামক ভাইরাস জনিত রোগ। চিংড়ি খামার এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে তিন চার দিনের মধ্যে সমস্ত চিংড়ি মরে যায়। এর চিকিৎসায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। খামারে জৈবসার ও চুন প্রয়োগ করে এবং মাঝে মাঝে খামারের পানি পরিবর্তন করে এ রোগের প্রকোপ অনেকটা কমানো যায়। স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি উৎপাদনের জন্য খামার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

৪. বাংলাদেশের চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা

প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের আবহাওয়া চিংড়ি চাষের উপযোগী। বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের চিংড়ির আবাদ হয় যেমন গলদা ও বাগদা । গলদা চিংড়ি মিঠা পানিতে ভাল উৎপাদন হয় । তবে বর্তমানে লবণ পানিতেও গলদার আবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাগদা চিংড়ি লবণ পানিতে চাষ হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় জোয়ার ভাটার লবণ পানির প্রবাহে হাজার হাজার বাগদা চিংড়ির খামার গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা অনেক বেশি। কারণ বাংলাদেশে অধিকাংশ খামারে জৈবিক পদ্ধতিতে চিংড়ি উৎপাদন হয়। প্রাকৃতিক উৎসে যেভাবে চিংড়ি উৎপাদন হয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারে সে ভাবে চিংড়ি চাষ হয়। ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিমভাবে কোন হরমোন বা রাসায়নিক দ্রব্য খামারে প্রয়োগ করা হয় না। তাই বাংলাদেশের চিংড়ি অত্যন্ত সুস্বাদু। ইউরোপিয় ইউনিয়ন ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে আগামী ২০১০ সাল হতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত কোন কৃষিপণ্য তারা আমদানী করবে না

(আমার দেশ, ১৬ মে ২০০৭)। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চিংড়ির মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি বহুলাংশে বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ির অবদান

চিংড়িশিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশে যে কয়টি রপ্তানিপণ্য সম্পূর্ণ কাঁচামাল নির্ভর, চিংড়ি তার মধ্যে অন্যতম। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের মূল্য সংযোজন হার অনেক বেশি। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থির মূল্যে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ২১.৭৭ ভাগ। এতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা ৪.৮৬ ভাগ। একই অর্থবছরে মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮৯ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬)। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতে অবদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে চিংড়ি সম্পদ। অত্যন্ত রুচিকর ও উপাদেয় খাদ্য হিসেবে চিংড়ির কদর সর্বত্রই। তাই বিশ্ববাজারে চিংড়ি মাছের চাহিদা প্রতি বছরই বাড়ছে। এ চাহিদা পূরণের জন্য দেশে চিংড়ি চাষের প্রসার হয়েছে ব্যপকভাবে, ইতোমধ্যে চিংড়ি চাষ শিল্প হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণের জন্য খুলনা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানায় ছোট বড় অনেক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে উঠেছে। সমস্ত কৃষি পণ্যের মধ্যে হিমায়িত চিংড়ি থেকে ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় (করিম, ২০০৩)। চিংড়ি শিল্পের সাথে ছয় লক্ষ মানুষ সরাসরি জড়িত এবং তাদের মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। চিংড়ি শিল্পকে ঘিরে স্থানীয় পর্যায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে চিংড়ি উৎপাদন হয় ০.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৩-০৪ সালে উৎপাদন হয় ১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫)। ভারত ও থাইল্যান্ডে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন হয় ২০০০ হাজার কেজি, পক্ষান্তরে বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় মাত্র ২০০ কেজি। উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি আবাদ করা সম্ভব হলে আমাদের দেশে চিংড়ির উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ হতে ২০০৪-২০০৫ সালে বিশ্বের ১৭৩ টি দেশে ১৬০ প্রকার পণ্য রপ্তানি হয়, তার মধ্যে মাত্র ৮টি পণ্যের অবদান ৮৯ ভাগ যেখানে হিমায়িত চিংড়ির অবদান ৪.৮৬ শতাংশ (আমার দেশ, ১৬ মে ২০০৭)। রপ্তানিপণ্য হিসেবে চিংড়ির অবস্থান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। হিমায়িত খাদ্যে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার ১৯৯৪-৯৫ হতে ২০০৪-০৫ সালে প্রায় ৩৮ ভাগ বেড়েছে (সারণি-১)। বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুডস এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সরকারের নিকট প্রদত্ত কনসেপ্ট পেপার 'ভিশন ২০০৮' এ উল্লেখ করা হয়েছে ২০০৮ সালের মধ্যে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি বেড়ে দশ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

সারণি-০১ : প্রাথমিক রপ্তানিপণ্য থেকে আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পণ্যসমূহ	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-২০০৫
হিমায়িত খাদ্য	৩০৬	৩৪৪	৪২১
কাঁচা পাট	৭৯	৭২	৯৬
চা	৩৩	১৮	১৬
কৃষি পণ্য	১৩	১৮	৮২

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬, পৃ. ২৩৩

৬. উন্নত পদ্ধতিতে মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন

শ্রিম্প সিল অব কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন (এসএসওকিউও) একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মান সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। এসএসওকিউও আমাদের দেশে চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, ল্যাবরেটরি সার্ভিস ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি উৎপাদনের জন্য শ্রিম্প সিল অব কোয়ালিটি (এসএসওকিউ) পদ্ধতি কৃষকের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। পদ্ধতিটি ব্যবহার করে অনেক চিংড়ি চাষী ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় নিবিড় পদ্ধতিতে পুকুরে অথবা ছোট ছোট খামারে চিংড়ি চাষ করা হয়। ক্লোরিন প্রয়োগ করে খামারের পানি জীবাণুমুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর খামারের পানি পরিবর্তন করা হয় ফলে যেসব পরজীবী প্রাণী ভাইরাস বহন করে সেগুলি মারা যায়। এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে অল্প জমিতে বেশি ফলন পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মাটির তেমন ক্ষতি হয় না। এসএসওকিউ' পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটার খামারে ১০টি চিংড়ি রেণু চাষ করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় ১৬০০-২০০০ কেজি। পক্ষান্তরে সনাতন পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটার খামারে ১-২টি রেণু চাষ করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় ৪০০-৫০০ কেজি (হোসেন, ২০০৩)। এসএসওকিউ' পদ্ধতি আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। এসএসওকিউ' কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনে 'ইউএসএইড' এর অর্থায়নে কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও কারিগরি সহায়তা উন্নয়ন কর্মসূচির (এটিডিপি) অধীনে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ী উৎপাদনের জন্য চিংড়ী চাষীদের সহায়তা প্রদান করছে।

৭. চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রেতাদের দিক নির্দেশনা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আছে। এরমধ্যে ৬০টি প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে অনুমোদন লাভ করেছে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য সুবিধাদি বিবেচনা করে ৫৭টি কারখানার প্রত্যয়ন দিয়েছে। তারমধ্যে ৪০টি কারখানা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এলাকায় অবস্থিত, অন্যগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। হিমায়িত চিংড়িতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি ল্যাবরেটরি আছে। কিন্তু এখানে উন্নত যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত লোকবল নেই। তাই রপ্তানিকৃত হিমায়িত খাদ্য রাসায়নিক দ্রব্য ও জীবাণুমুক্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য রপ্তানির পূর্বে সিঙ্গাপুর থেকে নমুনা পরীক্ষা করতে হয়। ফলে রপ্তানিকারিদের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং অযথা সময় নষ্ট হয়। রপ্তানিকৃত চিংড়িতে ক্ষতিকর উপাদান নাইট্রোফুরান ও ক্লোরামফেনিকেল আছে কিনা তা পরীক্ষা করে এতদিন বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা পরিষদ সনদপত্র দিত। কিন্তু সনদপত্র প্রদত্ত রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়িতে বিদেশে ক্ষতিকর উপাদান সনাক্ত হওয়ায় অনেক মাছ দেশে ফিরে আসে। এরপর ২০০৫ সালে নভেম্বর মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এর প্রতিনিধি দল খুলনা, বাগেরহাট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল খামার মালিক, ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় বাজারে মাছ রপ্তানি ধরে রাখার জন্য কারখানা আইন ও মৎস্য আইন সংশোধন, হ্যাচারি আইন প্রণয়ন, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলোতে মানবদেহে ক্ষতিকারক উপাদান পরীক্ষায় যন্ত্রপাতি বসানোর পরামর্শ দেন। ইতোমধ্যে সরকারিভাবে বেশকিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা দেশসমূহের চাহিদা অনুযায়ী শতভাগ মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

৮. চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

দেশে উৎপাদিত চিংড়ির ৮৪ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে রপ্তানি হয়। ঐ সব দেশ চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য 'হ্যাসাপ' (হ্যাজার্ড এনালাইসিস এট ক্রিটিকেল কনট্রোল পয়েন্ট) পদ্ধতি অনুসরণের তাগিদ দেয়। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে হিমায়িত খাদ্যা রপ্তানিকারী দেশগুলোর জন্য হ্যাসাপ' নীতিমালা প্রণয়ন করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৯৭ সালে এ নীতিমালা গ্রহণ করে। বর্তমানে উভয় দেশ বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানির জন্য হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছে (মহিউদ্দিন, ২০০৩)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ নীতিমালা গ্রহণে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত দেশসমূহ বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানি বন্ধ করে দেবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত চিংড়িতে ক্ষতিকর ব্যকটেরিয়া জীবাণু পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ থেকে সরবরাহ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারী সংগঠন ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় চিংড়ি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রতিটি ধাপে চিংড়ির মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে আমাদের রপ্তানি আয় বহুগুণে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৯. স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা

কিছু খামার মালিক চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানো এবং দ্রুত বৃদ্ধির জন্য খামারে এন্টিবায়োটিক ও কীটনাশক প্রয়োগ করেন। ফলে উৎপাদিত চিংড়িতে ঐসব ক্ষতিকর উপাদান থেকে যায়। বাজরজাত করার সময়ে বিভিন্ন ধাপে চিংড়ি হাত বদলায়। এসময় দক্ষতার অভাবে এবং খামার থেকে কারখানা পর্যন্ত চিংড়ি সরবরাহে চিংড়ির গুণগত মান নষ্ট হয়। প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতার অভাবে চিংড়ির মানেরও অবনতি ঘটে। অন্যদিকে কারখানা মালিকগণ ও যথেষ্ট আন্তরিক না হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে চিংড়ির মান সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে রপ্তানিকৃত চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হয়।

১০. স্বাস্থ্য ও মানসম্মত চিংড়ির উৎপাদন

বর্তমানে চিংড়ির বাজার যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক। এমতাবস্থায়, রোগ-ব্যাধি দূর করে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে না পারলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১০.১ খামার পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি উৎপাদন

- চিংড়ি খামারের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সহনশীল ভাবে চিংড়ি চাষ করা;
- চিংড়ি খামারের আয়তন ছোট করে ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার দিকে নজর দেওয়া;
- খামারের পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- প্রতি বছর চিংড়ি আহরণের পর খামার শুকিয়ে চুন ও জৈব সার প্রয়োগ করা;

- খামারের আগাছা পরিষ্কার রাখা ও পোকামাকড় দমন করা;
- খামারের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংস্কার করা।

১০.২ চিংড়ি বাজারজাতকরণে মানসংরক্ষণ

- খামার থেকে মাছ আহরণের পর দ্রুত বাজারজাত করা;
- বাজারজাতকৃত চিংড়িতে দ্রুত বরফ দেওয়া;
- মাছ পরিবহনে ঝুড়ি ও অন্যান্য উপকরণ পরিস্কার পরিছন্ন রাখা;
- ডিপোতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় মাছ মজুত না রাখা;
- ডিপো লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা;
- স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত মাছ ডিপো তদারকি করা।

১০.৩ মাছ প্রক্রিয়াকরণ

- আমদানিকারী দেশসমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা;
- কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন করা;
- কারখানায় সঠিকভাবে মাছ গ্রেডিং করা;
- চিংড়ির মাথা ছাড়ানোর সাথে সংশ্লিষ্টদের হাত পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা;
- নিয়মিত কারখানা পরির্দশন করে কারখানার মান উন্নয়ন করা;
- বিষাক্ত দ্রব্য সনাক্ত করার জন্য প্রতিটি কারখানায় ল্যাবরেটরী স্থাপন করা।

১১. উপসংহার

এক সময় সোনালী আশ হিসেবে খ্যাত পাট দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ দখল করে ছিল।। বর্তমানে তৈরী পোশাক ঐ স্থান দখল করে আছে। এর পরেই চিংড়ির অবস্থান। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানিপণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। পোশাক শিল্প ২০০৫ সালের শুরুতে কোটামুক্ত বিশ্ববাজারে প্রবেশ করেছে। শুরুতে পোষাক শিল্প নিয়ে অনেক শঙ্কা ছিল। কিন্তু বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় পোশাক শিল্পের তেমন ক্ষতি হয়নি। পোশাক শিল্পের মতো বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি নিয়ে ইতোমধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ির মান ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে প্রধান আমদানিকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সনাক্ত করেছে। সঠিকভাবে চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের অন্যতম একটা খাত এর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য হিমায়িত চিংড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে 'ভিশন ২০০৮' এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

ইসলাম, এন, ২০০৫: "বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ ও সম্ভাবনা", *দৈনিক দিনকাল*, ২৭ জানুয়ারি ২০০৫ ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫: (ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০০৫) । পৃ.-৭৮ ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬: (ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০০৬) । পৃ.-৬০, ৬৭ ।

বাংলাদেশ চিংড়ি শিল্প, *দৈনিক সমকাল*, ১৭ নভেম্বর ২০০৫ ।

ইসলাম, এম ,২০০৫: হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে, *দৈনিক খবর*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ।

বিশ্বাস, মাসুদুল করিম ২০০৪: চিংড়ির খামার সংরক্ষণে এসএসওকিউ, বাংলাদেশ অবজারভার, ২৭ জুলাই

করিম, মাহমুদুল ২০০৩: স্টপ ব্লেমিং শ্রিম্প (ঢাকা: বাংলাদেশ এসএসওকিউ অর্গানাইজেশন) পৃ.২.

মহিউদ্দিন, এবিএম ,২০০৩: "চিংড়িচাষীদের মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন" (ঢাকা, বাংলাদেশ: এসএসওকিউ ও)

হোসেন, মল্লিক আনোয়ার ২০০৩: "বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ", বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা, ৮ম বর্ষ সংখ্যা, (ঢাকা: ইছামতি অফসেট প্রেস, নভেম্বর ২০০৩) । পৃ.-৪১ ।

মোস্তফা, কাজী নূরুল, ২০০৫: হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির ভবিষ্যৎ, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৩ নভেম্বর ২০০৫ ।

মাহমুদ, সুলতান ২০০৫: "হিমায়িত মাছ রপ্তানি হুমকির মুখে", *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ নভেম্বর ২০০৫ ।

চিংড়ির মান : সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইনকিলাব* ১৭ আগস্ট ২০০৫ ।

আমার দেশ, ১৬ মে ২০০৭

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৬ নভেম্বর ২০০৫ ।